DEC. 24 2000

শিক্ষার দুর্গতি ঠেকাতে হবে শিক্ষকদেরই

জাফর ইকবাল

মাত্র কিছুদিন আগে দাবী আদায়ের মহড়া শেষ করে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ আবারো শিক্ষা নিকেতনগুলোতে ফিরে গেছেন। তারা কি পেলেন আর কি পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আন্দোলন থামিয়ে ঘরে ফিরলেন সে হিসেব সংবাদপত্রের পাতায় তো দেখাই গেছে। একই সাথে সরকারী মুখপাত্ররাও ফলাও করে দেশবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন সব। শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের আন্দোলন পরিহার হওয়ায় আশ্বস্ত হয়েছেন অভিভাবকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের দাবী আদায়ের এই আন্দোলন পেশার উন্নয়নে নয়, পেশাজীবীদের উন্নয়নে পর্যাপ্ত শক্তিমত্তার প্রদর্শনী উপহার দিলেও আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে তা দূরীকরণে সামান্য পরিকল্পনা কি উপহার দিতে পেরেছে সরকারকে, অভিভাবকবৃন্দকে কিংবা সুধী নাগরিকদের?

নিশ্চিত করেই বলা যায়, নেতিবাচক জবাব ভিন্ন। এক্ষেত্রে অন্য কিছু প্রত্যাশা করাটা হবে একেবারেই অবান্তর। তবে এইখানে যতিচিহ্ন একে সকল প্রশ্নের পরিসমাপ্তি টানার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বলেই বলতে হয়, একজন শিক্ষক তার পারিবারিক পরিমন্ডলে একজন অভিভাবকও আপন পোষ্য কিংবা তার সন্তানদের কাছে, দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ না দিয়ে সরকারকেও স্মরণ করিয়ে দেয়া ভাল, শুধু শিক্ষকদের ভাগ্য উন্নয়ন নয়, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া না গেলে এমন একটা দিন আসবে যখন কোনকিছুই নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। কারণ এখন শিক্ষা পরিণত হতে চলেছে ব্যবসায় এবং এই ব্যবসায় সততা আর নিষ্ঠার কবর রচিত হতে চলেছে জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে।

শহরগুলোর কথাই বলা ভালো, বিশেষ করে বড় শহরগুলোর কথা, কারণ দেশের অর্থনীতি এখন নগর-কেন্দ্রিক, সামাজিক ব্যবস্থাও নগরগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে, সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার উপায় নেই এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের। ছাত্র-ছাত্রী, যারা স্কুল পর্যায়ের শেষ প্রান্তিকে পৌছেছে, তারা যতটা সময় স্কুলের ক্লাসে কাটায় তার চাইতে বেশী সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে হয় কোচিং ক্লাসে কিংবা প্রাইভেট টিউটরদের কাছে। টিউটর আর কোচিং-এর সিডিউল নিতে গিয়ে অভিভাবকদের দৌড়-ঝাঁপে ক্লান্তি দেখানোর উপায় নেই, সর্বনাশ হয়ে যাবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে কিংবা যুৎসই নম্বর পেতে হলে এর বিকল্প নেই এখন। কোচিং কিংবা টিউটরের বেতন-সম্মানী নিয়ে প্রশ্ন করার উপায় নেই। যে যা চাইবেন তাই শিরোধার্য বিবেচনা করতে হবে। বিজ্ঞান, বাণিজ্য কিংবা ইংরেজীর মত কঠিন বিষয় নিয়ে এই টিউশনি আর কোচিং নয়, হাতের অক্ষর সুন্দর করা থেকে শুরু করে চিত্রাঙ্কন, এমনকি পরীক্ষায় প্রশ্ন কেমন হতে পারে সে ধরনের মডেল টেস্ট নিয়েও শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা।

উচ্চমাধ্যমিক কিংবা স্কুলের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষাগুলোর জন্যেই শুধু কোচিং আর টিউশনি নয়, নার্সারী স্কুলে ভর্তি করা থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীর আইএসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রেসক্রিপশন বিতরণ হচ্ছে এই কোচিং আর টিউশনির মাধ্যমে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যস্ততা এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তারা ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ বাড়ীর ড্রইং রুম কিংবা বৈঠকখানায় জায়গা দিতে না পেরে বাড়ীভাড়া করে আয়োজন করছেন কোচিং ক্লাস আর টিউশনির। একাধারে এক কথা বারংবার বলার ক্লান্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে অনেক কোচিং-এ টেপ রেকর্ডার কিংবা ভিডিও বাজিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের তালিম দেয়া হচ্ছে। অচিরেই হয়তবা কম্পিউটার আর ইন্টারনেটেও এসে যাবে। শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ স্কুল-কলেজের পড়ানোর সাইনবোর্ডটি ব্যবহার করছেন কোচিং আর টিউশনীতে ছাত্র ধরার ফাঁদ হিসেবে। ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে মন্দ নম্বর পেলে সদাশয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অভিভাবকদের ডেকে পরামর্শ দেন কোচিং-এ ভর্তি করার। নিরুপায় অভিভাবকদের কোচিং-এ টাকা ঢালা ভিন্ন কিইবা আর করার থাকে। ঢাকা শহরের অলিগলি ঘুরে বুঝা যাবে, মুদি দোকানের চাইতেও অধিক গজিয়ে গেছে কোচিং আর টিউশানীর কারবার। এই কোচিং আর টিউশনি ব্যবসা থেকে সরকারের আয়কর কি পরিমাণ আসে সে হিসেব আদৌ কেউ জিজ্ঞেস করেনি বটে তবে ট্রেড লাইসেন্স আছে অনেক কোচিং সেন্টারের এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এভাবে এন্তার দোষারূপ শুনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয়ে সমুদয় শিক্ষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতেই পারেন। এক্ষেত্রে তাদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ আছে, আন্যান্য পেশায় উপরি আয়ের বিষয় নিশ্চিতই আছে প্রায়, শিক্ষকরা করলে দোষটা কোথায়? সদাশয় শিক্ষকবৃন্দের দোষের হিসেব টেনে কোন বিতন্ডায় না গিয়ে একটা প্রশ্ন তাদের কাছে রাখলে তারাই হয়ত সমুদয় পরিস্থিতি আপন করে বিবেচনায় আনতে পারবেন, একজন শিক্ষক হিসেবে হাজার যুক্তি শেষ করে একবার অভিভাবকের কাতারে এসে দাঁড়িয়ে বিবেচনা করুন কি এক অক্টোপাসের আক্রমণের মুখে ঠেলে দিয়েছেন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

নগরকেন্দ্রিক শিক্ষার এই নৈরাজ্যের প্রতিপক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে গ্রামগঞ্জের শিক্ষকদের একটা কথা বলার সুযোগ আছে, গ্রামের অভিভাবকরা এত পয়সা খরচের সংগতি রাখেন না। সুতরাং সুযোগ সীমিত বলেই আমাদের সে পথে যাওয়া হয় না। যুক্তি অকাট্য হলেও গ্রামীণ পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সোচ্চার হতে অনাগ্রহী। এতে ঐক্য ভেঙ্গে যাবে। স্বজাতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে যতই আপত্তি তারা করুক না কেন, নগরকেন্দ্রিক শিক্ষার এই প্রক্রিয়া গ্রামীন শিক্ষার পরিবেশকে অতিদ্রুত পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং তার কুফলও ইতিমধ্যেই তারা পেতে শুরু করেছে।

সামান্য সংগতি আছে তেমন অভিভাবকরা এখন আর গ্রামীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ সন্তান কিংবা পোষ্যদের রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের শহরে। যাদের সংগতি আছে তারা বোর্ডিং কিংবা মেসে থেকে অভিভাবকদের অর্থে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। যাদের সংগতি সীমিত তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে নিচের ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে কায়ক্লেশে নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিশ্রমী কিংবা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী থাকছে না বলেই পরীক্ষা এলে দেখা যায় শিক্ষকসুদ্ধ নকলবাজিতে ধরা খাচ্ছে পরীক্ষার সময়। ছাত্রছাত্রী না থাকলে শিক্ষা নিকেতন চলবে না, ছাত্র-ছাত্রী ভাল ফলাফল না করতে পারলে অভিভাবকরা ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ঝুঁকি নেবে না। এই বিষয়টি বিবেচনায় এনেই হয়তবা গ্রামের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হবার নয়। কারণ শহরে রয়েছে প্রশ্ন তৈরি করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দামী শিক্ষক, পরীক্ষার খাতা দেখার মত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক। তারা কোচিং-এ গিয়ে আকার ইঙ্গিতে যে জ্ঞান বিতরণ করে আসছেন নকলবাজির প্রতিযোগিতায় তার সাথেতো পেরে উঠা সম্ভব নয়।

পরীক্ষার যখন ফল প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় শতকরা আশিজন স্টার মার্কধারী শহরের স্কুল-কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রী। শহরের ভাল স্কুলগুলোর পাসের হার শতকরা আশি থেকে নব্বই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ গ্রামগুলোতে স্টার মার্ক পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী খুঁজতে হয়। শুধু কি তাই, ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে খুলনা রাজশাহীর। ঠিক একইভাবে দূরে চলে যাচ্ছে নিবিড় পল্লীর শিক্ষাঙ্গনগুলো। ঠিক এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে গ্রামের শিক্ষায়তনগুলো কি টিকে থাকতে পারবে?

সম্প্রতি একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময় বলেই দেয়া হয়েছে যে, সবগুলো শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার মান সমান নয়। এজন্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করে লাভ হবার নয়, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণেই এই অবক্ষয়ের অক্টোপাস ঝাপটে ধরেছে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এই অক্টোপাসের আক্রমণ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে শিক্ষকদের, সরকার কিংবা অভিভাবকরা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একেবারেই অসহায় হয়ে গেছেন। গ্রামের শিক্ষকরা যদি শহরের শিক্ষকদের সমালোচনায় সোচ্চার হয় এবং শহরের শিক্ষকরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় আনার ব্যাপারে সামান্য আন্তরিক হন তাহলে অবস্থা পাল্টাতে খুব একটা সময়ের প্রয়োজন হবে না। আর তা করতে যদি তারা ব্যর্থ হন তাহলে অবস্থার চাপে অভিভাবকরা ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হবে এবং সে সময় সরকার নিরুপায় হয়েই অভিভাবকদের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন। ■ (চলবে)

শিক্ষিকাবৃন্দ স্কুল-কলেজের পড়ানোর সাইনবোর্ডটি ব্যবহার করছেন কোচিং আর টিউশনীতে ছাত্র ধরার ফাঁদ হিসেবে। ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে মন্দ নম্বর পেলে সদাশয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অভিভাবকদের ডেকে পরামর্শ দেন কোচিং-এ ভর্তি করার। নিরুপায় অভিভাবকদের কোচিং-এ টাকা ঢালা ভিন্ন কিইবা আর করার থাকে। ঢাকা শহরের অলিগলি ঘুরে বুঝা যাবে, মুদি দোকানের চাইতেও অধিক গজিয়ে গেছে কোচিং আর টিউশানীর কারবার। এই কোচিং আর টিউশনি ব্যবসা থেকে সরকারের আয়কর কি পরিমাণ আসে সে হিসেব আদৌ কেউ জিজ্ঞেস করেনি বটে তবে ট্রেড লাইসেন্স আছে অনেক কোচিং সেন্টারের এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।